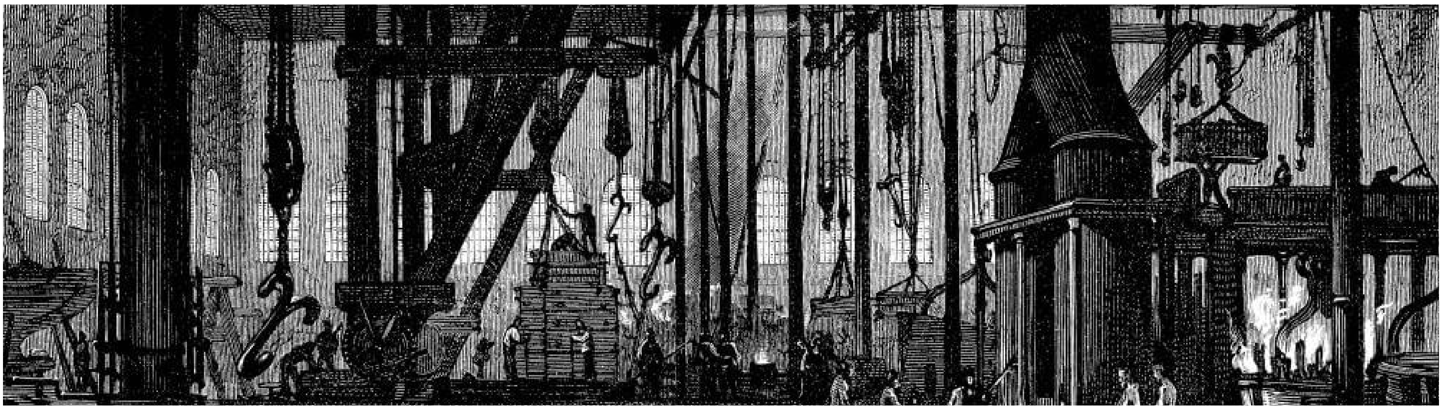

# সাংস্কৃতিক দাসত্ব রাজনৈতিক দাসত্ব থেকে বিছিন্ন নয়

**মরিয়ম জামিলা**

যদিও এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আমাদের ঈমান এবং মানুষ হিসেবে আমাদের অনন্য পরিচিতির দিক থেকে বিদেশী রাজনৈতিক শাসনের চাইতে সাংস্কৃতিক অধীন অনেক বেশি ক্ষতিকর। তবে বাস্তবে সাংস্কৃতিক দাসত্ব রাজনৈতিক দাসত্বের সঙ্গে শুধুমাত্র সম্পৃক্তই নয় বরং সকল ইচ্ছা ও কাজে তা অবিভাজ্য। প্রায় ৬শ□ বছর আগের কৃতি মুসলমান ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন তার মুকাদ্দিমায় এই সত্য স্বীকার করেছেন।

□□বিজিতরা সব সময় বিজয়ীদের পোশাক, প্রতীক, বিশ্বাস এবং অন্যান্য আচার-প্রথা অনুকরণ করতে চেষ্টা করে। এর কারণ হচ্ছে মানুষ সব সময় বিজয়ীদের কাছে প্রিয়পাত্র হতে আগ্রহী হয়। এটা দুই কারণে হয়-

প্রথমতঃ বিজয়ীদের প্রতি শ্রদ্ধা, দ্বিতীয়তঃ বিজয়ীদের মত যোগ্যতার অধিকারী হলে তাদের পরাজয় হতো না এই মনোভাব হেতু যোগ্যতা অর্জনের জন্যে। এই বিশ্বাস দীর্ঘস্থায়ী হলে এটা একটা ব্যাপক আস্থার ভাব সৃষ্টি করে। বিজয়ীদের সকল কিছু অনুকরণে বিজিতরা অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এই বিশ্বাস অজ্ঞাতভাবে অথবা বিজয়ের জন্যে বিজয়ীদের শারীরিক ও অস্ত্রের শক্তির চাইতে আচার-আচরণ প্রাধান্য বিস্তার করেছে এই বিশ্বাস থেকে সৃষ্টি হতে পারে। এই অবস্থায় তখন এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, বিজয়ীদের অনুকরণ পরাজয়ের কারণ দূরীভূত করবে। এইভাবে দেখা যায়, বিজিতরা পোশাক, অস্ত্র ধারণ যন্ত্রপাতি এবং জীবন ধারণের সকল পদ্ধতিতে বিজয়ীদের অনুকরণ করে। বস্তুত প্রতিটি দেশই তার বৃহৎ বিজয়ী প্রতিবেশীকে অনুকরণের চেষ্টা করে। স্পেনের মুসলমানেরা বিজয়ী প্রতিবেশী খৃস্টানদের অনুকরণ করেছে। খৃস্টানদের পোশাক, অলঙ্কার এবং আচার-আচরণের বিভিন্ন দিক এমনকি ঘরে ছবি রাখার ব্যাপারে মুসলমানরা তাদের অনুকরন করেছে। সযত্ন পর্যবেক্ষণে এই হীনমন্যতা সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়বে।□□

ইবনে খালদুন মানুষের মনস্তত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। তার সময়ের স্পেনিশ মুসলমানদের ন্যায় আজকের ভারত উপমহাদেশের মুসলমানরাও অনুকরণ করছে। অবশ্য ভুলে যাওয়া উচিত নয় বিদেশী সভ্যতার অন্ধ ও সমালোচনাহীন অনুকরণ স্বতঃস্ফূর্ত নয়। আমাদের বিদেশী প্রভুরা শাসনের প্রথম লগ্ন থেকেই খুব সতর্কতার সঙ্গে আমাদের জীবন পদ্ধতিকে ধ্বংস করে সেখানে তাদের আচার-পদ্ধতি চালুর ষড়যন্ত্র করেছিলেন। তার ফলে অনেকটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তাদের আচার-প্রথা প্রবেশ করেছে।

প্রায় একশ বছর আগে বৃটিশ সরকার উপমহাদেশের মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদান এবং কার্যকরভাবে শাসনের নির্দিষ্ট পদক্ষেপের প্রস্তাব দানের জন্যে উইলিয়াম হান্টারকে নিযুক্ত করেছিলেন। সেই হিসেবে ১৮৭১ সালে তিনি লিখলেনঃ আমাদের ভারতীয় মুসলমান, তারা কি রাণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বিবেকের কাছে বাধা! মুসলমানদের প্রতিরোদ ভেঙ্গে ফেলার জন্যে এবং তাদেরকে অনির্দিষ্টকালের জন্যে বিদেশী প্রভুত্ব মেনে নিতে শান্তভাবে আত্মসমর্পণ করানোর জন্যে □সবজান্তা□ ডঃ হান্টার প্রস্তাব করেছেন ইংরেজি শিক্ষার। তাই বইয়ের সমাপ্তি পর্বে তিনি তার সরকারকে পরামর্শ দিয়েছেন, □□এভাবে মুসলমান যুবকদেরকে আমাদের নিজস্ব পরিকল্পনার ভিত্তিতে শিক্ষিত করে তুলতে পারি। তাদের ধর্মীয় ব্যাপারে এবং ধর্মশিক্ষার বিষয়ে সামান্যতম হস্তক্ষেপ না করেই আমরা তাদেরকে এমনভাবে গড়ে তুলতে পারি, যাতে করে তারা ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করলেও ধর্মান্ধ হবে না। বিশ্বের অন্যতম চরম গোঁড়া সম্প্রদায় হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুরা যেভাবে সহনশীলতার শিক্ষা পেয়েছে, মুসলমানদেরকেও সেই

পদ্ধতি অনুসরণে উৎসাহিত করা যেতে পারে। অনুরূপ সহনশীলতা মুসলমানদেরকে তাদের পূর্ব-পুরুষদের গোঁড়ামী থেকে মুক্ত করে আনবে, যে গোঁড়ামী তাদেরকে নিষ্ঠুরতা, নির্দয়তা ও অপরাধজনক কাজের মধ্যে টেনে নিয়ে গেছে। আর এসবই তারা করে এসেছে ধর্ম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে। মুসলমানী আইনশাস্ত্র আবশ্যিক বিষয় হিসেবে নিয়মিত পড়ানো হবে কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ রয়েছে। কিন্তু এটাকেই শিক্ষার মৌল লক্ষ্য হিসেবে ধরে নেয়া ঠিক হবে না। মুসলমানী আইন মানে মুসলমানী ধর্ম, মুসলমানরা সমগ্র পৃথিবীতে তাদের আইনানুগ অধিকারে বিশ্বাসী। তারা আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব, আনুগত্য অথবা খৃষ্টান সরকারের অধীনতার কথা জানে না। মুসলমানী আইন সরকারের কোনো প্রয়োজন এবং জীবন সম্পর্কে তার ছাত্রদেরকে কোনো ধারণা দেয় না। এর পরিবর্তে আমাদের উচিত একটা উদীয়মান মুসলিম জাতি গড়ে তোলা যারা নিজস্ব সংকীর্ণ শিক্ষা পদ্ধতি ও মধ্যযুগীয় ভাবধারার গণ্ডীতে আবদ্ধ না থেকে পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞানের নমনীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হবে।

ইংরেজি প্রশিক্ষণ জীবনের লাভজনক অধ্যায়ে প্রবেশের নিশ্চয়তা দেবে। কোন পদ্ধতির প্রবর্তনের দ্বারা হিন্দু ও মুসলমানদের সমভাবে উচ্চতর ধর্মীয় ধারণায় উন্নীত করা সম্ভব, সে সম্পর্কে আমি এখানে কিছু বলতে চাই না। তবে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, অনুরূপ উন্নত অবস্থায় তারা একদিন উপনীত হবে এবং এতদিন নেতিবাচক ভূমিকা পালন করলেও আমাদের প্রবর্তিত শিক্ষা পদ্ধতি হচ্ছে এ বিষয়ে প্রাথমিক পদক্ষেপ।□□

> উইলিয়াম হান্টারের ভবিষ্যৎবাণী সত্যে পরিণত হয়েছে এবং আজ আমরা তার ফল ভোগ করছি। বংশ পরম্পরায় পাওয়া সেই সম্পত্তি ৪৭-এর স্বাধীনতার পরও সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় এখনও বহাল রয়েছে। বৃটিশ শিক্ষা পদ্ধতি এতই দক্ষতার সঙ্গে বাস্তবায়িত হয়েছে যে, সমগ্র উপমহাদেশে আধুনিকতা তথা ধর্মনিরপেক্ষতার বস্তুবাদ ও নাস্তিক্যবাদের মোকাবিলা করার জন্যে পর্যাপ্ত ইসলামী জ্ঞানদানে সক্ষম একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও কোথাও নেই। আমাদের যুবকেরা নিজেদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কোনো আকর্ষণ ছাড়াই বড় হচ্ছে এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই।

বিগত শতাব্দীর শেষ দিকে Lord Cromer ছিলেন আরব বিশ্বে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দোর্দণ্ড প্রতাপশালী ব্যক্তিত্ব। ১৮৮৩ থেকে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত পঁচিশ বছর প্রতিবন্ধকতাহীনভাবে তিনি মিশর শাসন করেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কৌশল জানার জন্যে তার বিরাট বই Modern Egypt অপরিহার্য। এই বইয়ের সমাপ্তিতে তিনি কোনো সন্দেহের অবকাশ রাখেননি যে, সরাসরি রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের চাইতে সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের নীতিই ছিল তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

Lord Cromer লিখেছেন, □□কোনো বাস্তবজ্ঞান সম্পন্ন রাজনীতিকের চিন্তা করা ঠিক নয় যে, ইসলামকে পুনর্জীবন দানে সক্ষম এমন পরিকল্পনা তাদের রয়েছে, বস্তুতঃ ইসলাম এখনো মরে যায়নি, বরং শতাব্দী ধরে টিকে থাকার যোগ্য। তবে রাজনৈতিক এবং সামাজিক দিক থেকে তা মৃতপ্রায়, তার ক্রমাগত অবনতি কোনো আধুনিক তত্ত্ব প্রয়োগে, তা যতই দক্ষতার সঙ্গে করা হোক না কেন ঠেকানো যাবে না। এই পর্যন্ত যতটুকু বিচার করা যায়, তাতে দুটি মাত্র বিকল্প পন্থা সম্ভব। মিশরকে পর্যায়ক্রমে স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে নতুবা বৃটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করে নিতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে আমি এই দুই বিকল্পের প্রথমটির পক্ষে। আমরা যা করব তাতে ভাল, জোরদার এবং স্থিতিশীল সরকারের ব্যবস্থা করতে হবে যা অরাজকতা এবং দেউলিয়াত্ব দূর করে মিশরকে ইউরোপের জন্যে সমস্যায় পরিণত হওয়া থেকে রক্ষা করবে। এ ধরনের সরকারের কাজে আমাদের বেশি মাথা ঘামানো উচিত নয়। তবে আমাদের বিদায়ের পর সরকারকে এমনভাবে কাজ করতে হবে যা পশ্চিমা সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ□ এটা মনে করা ঠিক হবে না যে, মিশরের সম্পূর্ণ মুসলমানী নীতির ওপর প্রাচীন চিন্তাধারা ও পশ্চাদগামী সরকার প্রতিষ্ঠার সময় ইউরোপ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করবে। মিশর যে পর্যায়ে পৌঁছেছে, তাতে ঐ ধরনের চিন্তাধারা অনুসৃত হলে বস্তুগত স্বার্থের সাংঘাতিক ক্ষতি হবে। যারা এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে চান এবং সমস্যার সমাধান চান, তাদেরকে এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে মিশরের নতুন বংশধর পশ্চিমা সভ্যতা সত্যিকারভাবে অনুসরণ বা গ্রহণে বাধ্য হয়। আমার বিশ্বাস ইংল্যান্ডের সুমহান পরিচালনায় পশ্চিমা সভ্যতার রশ্মি কৃষ্ণ আফ্রিকার সবচাইতে দুর্ভেদ্যস্থানে গিয়ে পৌঁছবে এবং এমনকি মিশরের ক্লেদাক্ত কৃষকেরাও তাতে নতুন জীবন লাভ করবে। মিশরীয়দের অজ্ঞতা এবং অকৃতজ্ঞতা সত্ত্বেও আমি এখনো আশা করি, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ বংশধরেরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ রাখবে যে, Anglo-Saxon জাতির লোকেরা প্রথম তাদের অত্যাচারী কৃতদাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছে, তারা তাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে যে, তারাও মানবিক আচরণ পাওয়ার অধিকারী। তারা তাদের সামনে নৈতিক অগ্রগতি এবং চিন্তার স্বাধীনতা ও বস্তুগত সুখ, স্বাচ্ছন্দ্যোর পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে পশ্চিমা সভ্যতার সত্যিকার মহাসড়ক।□□

এটাই ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মূল লক্ষ্য। স্বাধীনতারপরও কেন আমাদের ওপর বিদেশী প্রভাব এত জোরদার তার জবাবও এই বৃটিশ শাসকের উক্তি থেকে পাওয়া যাবে। বস্তুতঃ সকল প্রচারণা সত্ত্বেও আমাদের স্বাধীনতা একটা সামান্য ব্যাপার মাত্র। দীর্ঘদিন

আমাদের দেশ বিদেশী শাসনাধীন ছিল, আমাদের জনগণকে অতীত ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে বিদেশী প্রভুরা খুব যত্নের সঙ্গে সবরকম প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এইভাবে তারা সাফল্যের সঙ্গে বিশেষতঃ সামাজিক দিক থেকে প্রাজ্ঞ লোকদের মধ্য থেকে একদল সাক্ষীগোপাল ও গৃহশত্রু বিভীষণ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। তথাকথিত রাজনৈতিক স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়ার পর আমাদের নেতৃত্ব এই পশ্চিমা চক্রের হাতে গিয়ে পড়ে। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে এই নেতৃত্ব অব্যাহত থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ল। কারণ আমাদের জনসংখ্যার বৃহৎ অংশই তাদের ধ্যান ধারণা এবং তাদেরকে ঘৃণা করতো, এই কারণে গণতান্ত্রিক পন্থায় পশ্চিমা সভ্যতার বাস্তবায়ন অসম্ভব হয়ে পড়ল। এই জন্যে খুবই শক্ত হাতে একনায়কত্ব চাপিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা হলো। যারা এর বিরোধিতা করলো তাদেরকে নির্দয়ভাবে নিশ্চিহ্ন করা হলো। এমন কি ইংল্যান্ড, ফ্রান্স এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত বৃহৎ শক্তিগুলো তাদের জনগণকে দেয়া গণতান্ত্রিক সুযোগ-সুবিধা মুসলমানদের দিতে রাজী হবে না, কারণ তারা ভাল করেই জানে মুসলমানদের মনে ইসলামের প্রভাব খুবই জোরদার, গণতান্ত্রিক রায় প্রকাশের সুযোগ একবার আসলেই সকল মুসলিম অধ্যুষিত দেশ ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হবে। আর এই অবস্থা হলে এশিয়া ও আফ্রিকায় তাদের প্রভুত্ব চিরদিনের জন্যে খতম হয়ে যাবে। এই জন্যে ইসলামী আন্দোলনকে তাদের বিরাট ভয়। বিশ্বব্যাপী তাদের সংগঠিত সকল চক্রান্তের লক্ষ্য হচ্ছে ইসলামী আন্দোলনকে শেষ করা।

> রাজনৈতিক দাসত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত অর্থনৈতিক দাসত্বকেও আমরা উপেক্ষা করতে পারি না, বরং বলা যায় অর্থনৈতিক দাসত্বই আমাদের এই পরিস্থিতি নিক্ষিপ্ত হতে বাধ্য করেছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের নামে বৃহৎ শক্তিবর্গ বিদেশী সাহায্যের টোপ গেলাতে উৎকণ্ঠিত। উচ্চহারে সুদ নিয়ে এই সাহায্য শেষ পর্যন্ত গ্রহীতা দেশকে ভিক্ষুকে পরিণত করে। এতে কোনো অতিশয়োক্তি নেই যে, পশ্চিমা বিরাট বাণিজ্যিক সংস্থাগুলো তাদের সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশের প্রধান মাধ্যম। অনুন্নত (এখন উন্নয়নগামী) মুসলিম দেশসমূহে অর্থনৈতিক উন্নয়নের নামে পর্যায়ক্রমে বিরাট বিলাসবহুল ভবন, অত্যাধুনিক কারুকার্যের হোটেল, শহরের রূপ পাল্টিয়ে দেয়।

ব্যবস্থা হয় নৈশ ক্লাব এবং ক্যাবারে নাচের। হলিউড থেকে অপরাধমূলক ও অবৈধ যৌন সংসর্গের জঘন্য ছবি আসে, তার অনুকরণে দেশে ছবি নির্মিত হয়, পর্ণ ছবি, পুস্তক এবং বিদঘুটে পোশাক এসে বাজারে সয়লাভের সৃষ্টি করে যা সামাজিক উৎকর্ষতার চুড়ান্ত বিকাশ বলে বিবেচিত হয়। খাদ্যে ভেজাল দেয়া আমাদের শরিয়তে বিরাট পাপ বলে গন্য হলেও এই পরিবেশে তা দ্রুত প্রসার লাভ করে এবং অন্যের জীবন ও স্বাস্থ্যের বিনিময়ে ভেজালদানকারী দিনে দিনে প্রাচুর্যের উচ্চ শিখরে আরোহন করে। মাদক দ্রব্যের ব্যবহার অস্বাভাবিক বেড়ে যায়, আমাদের বেতারগুলো কদর্য ও নগ্ন গানে সাধারণ মানুষকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

বিদেশী প্রভাবিত শিল্প ও বাণিজ্যিক সংস্থায় পুরুষদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ করিয়ে মেয়েদেরকে চাকুরিতে নেয়া হয়। এইভাবে আমাদের মহিলারা স্ত্রী, মা, বোন এবং কন্যার পবিত্র আসন থেকে বাস ট্রেনের টিকেট সংগ্রাহক, ব্যাংকের কেরানী, টেলিফোন অপারেটর, সেলস গার্ল, বিমানবালা, রেস্তোরার ওয়েট্রেস, হোটেলের কক্ষ সেবিকা, ফ্যাশন মডেল এবং বেতার, টেলিভিশন, ছায়াছবি ও রাষ্ট্রে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের গায়িকা ও নর্তকীতে পরিণত হয়। এইভাবে পর্যায়ক্রমে পর্দা, বাড়ি, পরিবার অবৈধ যৌন সংসর্গের জোয়ারে ভেসে যায়। যুবক যুবতীরা একটি সমাজিক ব্যাধি হিসেবে গড়ে উঠে। এইসব ব্যাপার আকস্মিকভাবে হয় না বরং আমাদের ওপর যারা প্রভুত্ব বজায় রাখতে চায়, তারা খুব সতর্কতা ও দক্ষতার সঙ্গে আমাদের জীবন প্রবাহে এই সবের অনুপ্রবেশ করিয়ে দেয়। আমাদের শত্রুরা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিকে থেকে আমাদের অধঃপতন ঘটিয়ে দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে ছোট করতে চায়। তাদরে স্বার্থেই অধঃপতন ঘটুক, আমাদের দেশ দুর্নীতিতে ভেসে যাক এটাই তাদরে কাম্য।

এই ভীতি কার্যকরভাবে মোকাবিলার জন্যে আমাদেরকে বুঝতে হবে রাজনৈতিক দাসত্ব কেন অবিচ্ছেদ্য, সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝতে হবে যে, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ছাড়া সত্যিকার রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়। বিরোধী এবং বিদেশী শাসনের অধীনে ইসলামের উৎকর্ষ অসম্ভব। সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা অর্জনের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আমাদের ইসলামী পুনর্জাগরণের সকল আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন জানাতে হবে এবং আমাদের সরকার যাতে আইন হিসেবে ইসলামের নির্ভেজাল শরিয়তকে গ্রহণ করে, সে জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে।

ইসলামী আন্দোলনকে সকল গণসংযোগ মাধ্যমের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করতে হবে এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে হবে। কোনো বিদেশী শক্তি যাতে আমাদের ভূখণ্ডে সামরিক ঘাঁটি করতে না পারে, তার তীব্র বিরোধিতা করতে হবে এবং

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে আমাদের সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব সম্পদ ও বন্ধু মুসলিম দেশগুলোর ওপর নির্ভর করতে হবে। প্লেগরূপী বিদেশী সাহায্য অবশ্যই পরিহার করতে হবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক লেনদেনে, বিশেষ করে বৃহৎ শক্তিবর্গের সঙ্গে আমাদেরকে সমঅংশীদার হিসেবে সৎ ব্যবসার ওপর জোর দিতে হবে। ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ সব সময় ইসলামকে তাদরে শক্তিশালী শত্রু জ্ঞান করে আসছেন।

ফলে তাদের নতুন বংশধরেরা একই দৃষ্টিভঙ্গিতে ইসলামকে অধ্যয়ন করে থাকে। পশ্চিম ইউরোপ থেকে উদ্ভুত বস্তুবাদী দর্শনই প্রতিটি মুসলিম দেশে ইসলামী জীবন পদ্ধতি পুনরুজ্জীবনে সবচাইতে বড় বাধা হয়ে আছে। এই কারণে আমাদের কিছু উলামাকে পাশ্চাত্যের অধিবাসী হয়ে ইউরোপের সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম এবং দর্শন পড়তে হবে, যাতে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে উন্নত দর্শন উপস্থাপন করা যায়। এইভাবে সকল দিক থেকে আমাদেরকে সাম্রাজ্যবাদের মোকাবিলা করতে হবে যাতে ঈমানের শক্তিবৃদ্ধি হয়ে আমরা দুনিয়া ও আখেরাতে সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারি।

[প্রবন্ধটি মরিয়ম জামিলার বিখ্যাত “ইসলাম ও আধুনিকতা” গ্রন্থ থেকে নেওয়া।]

সূত্রঃ জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত “সংস্কৃতিঃ জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন ২০০২” স্মারক গ্রন্থ

মরিয়ম জামিলা

খ্যাতনামা মুসলিম লেখিকা মরিয়ম জামিলা ২৩ মে ১৯৩৪ সালে নিউইয়র্কে এক জার্মান বংশোদ্ভুত ইহুদি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬১ সালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁকে আমেরিকান ইহুদী নারীদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী মনে করা হয়। মার্গারেট মার্কাস নাম্নী এই মহিয়সী নারী শৈশব থেকে মানসিক রোগাক্রান্ত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে অসুস্থতার জন্য তাঁকে কয়েকবার বিরতি দিতে হয়। শেষ পর্যন্ত সিজোফ্রেনিয়া রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাকে অনার্স শেষ না করেই শিক্ষাজীবন শেষ করতে হয়। স্কুল জীবনেই তিনি আরব সংস্কৃতি ও ইতিহাসের প্রতি আকৃষ্ট হন। বিশেষত: আরব ও ফিলিস্তীনীদের দুর্ভোগ তাকে চরমভাবে ব্যথিত করে তুলেছিল। মাত্র বারো বছর বয়সে তিনি ফিলিস্তীনী আশ্রয়শিবিরকে কেন্দ্র করে একটি গল্পগ্রন্থ লেখেন। একজন ভালো চিত্রকরও ছিলেন তিনি। অতঃপর বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে ইহুদীসহ বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রুপের সংস্পর্শে আসেন, কিন্তু তাদের সকলেই জায়নবাদকে সমর্থন করায় তিনি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না।
১৯৫৩ সালে অসুস্থতায় পড়ার পর তিনি ইসলাম ও কুরআনকে জানার সুযোগ পান এবং এর দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হন। মুহাম্মাদ আসাদের বিখ্যাত The Road to Mecca বইটিও তাকে অনুপ্রাণিত করে যা তাকে ইসলাম গ্রহণের পথ তৈরী করে দেয়। ১৯৫৭-৫৯ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ দু’বছর তাঁকে হাসপাতালে কাটাতে হয়। সুস্থ হওয়ার পর তিনি বাড়িতে ফিরে আসেন এবং বিভিন্ন ইসলামী সংগঠনের সাথে যুক্ত হন। দেশ-বিদেশের ইসলামী ব্যক্তিত্বগণের সাথে যোগাযোগ করতে থাকেন। বিশেষ করে পাকিস্তান জামা’আতে ইসলামীর আমীর মাওলানা মওদূদীর সাথে তাঁর যোগাযোগ হয়। শেষ পর্যন্ত ১৯৬১ সালের মে মাসে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মরিয়ম জামীলা নাম ধারণ করেন।
১৯৬২ সালে তিনি মাওলানা মওদূদীর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে পাকিস্তানে গমন করেন এবং সেখানেই ১৯৬৩ সালে মুহাম্মাদ ইউসুফের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। পরবর্তী কয়েকবছর গভীরভাবে তিনি ইসলামের উপর পড়াশোনা করেন। অতঃপর লেখালেখির সাথে যুক্ত হন। সূক্ষ্ম ও সাহসী চেতনাশক্তির প্রয়োগ ঘটিয়ে তার ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে মুসলিম সমাজে আমদানীকৃত পশ্চিমা বস্তুবাদ, ধনতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও তথাকথিত আধুনিকতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। পরিণত হন একজন খ্যাতনামা কলমসৈনিকে। তাঁর সকল লেখনীতে পশ্চিমাদের মত তথাকথিত আধুনিক মুসলিমদেরকেও কোনরূপ ছাড় দেননি। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় তিরিশটি। এছাড়াও বহু প্রবন্ধ তিনি লিখেছেন। উর্দূ, ফারসী, বাংলা, তুর্কী, ইন্দোনেশিয়ান প্রভৃতি ভাষায় তার বেশ কিছু বই অনুবাদ করা হয়েছে। তাঁর যাবতীয় রচনা, বক্তব্য, ভিডিও ক্যাসেট, চিত্রকর্ম বর্তমানে নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত রয়েছে।
তার প্রসিদ্ধ কয়েকটি বই হল- ইসলাম ও আধুনিকতা, পশ্চিমাকরণ এবং মানবকল্যাণ, ইসলাম বনাম পাশ্চাত্য, ইসলাম বনাম আহলে কিতাব : অতীত ও বর্তমান, ইসলাম ও পশ্চিমা সমাজ, ইসলাম ও আজকের মুসলিম নারী সমাজ, ইসলামী সংস্কৃতি : তত্ত্ব ও প্রয়োগ, ইসলাম ও আধুনিক মানুষ, পশ্চিমাকরণ বনাম মুসলিম জনগণ ইত্যাদি। যে অসাধারণ প্রজ্ঞা ও বলিষ্ঠ চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তার প্রতিটি বইয়ে তা এককথায় অসাধারণ। গত শতকে তার মত বিদূষী মুসলিম নারী লেখিকার উদাহরণ খুব কম। এই মহীয়সি মুসলিম নারী ৩১ অক্টবর ২০১২ সালে পরলোক গমন করেন। তাঁর অবদানের জন্য মুসলিম উম্মাহ কিয়ামত পর্যন্ত স্মরণ করবে।